Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 158-164

সাহিত্য সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমানি পুথিসাহিত্য

ড. আব্দুল খায়ের সেখ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নকশালবাড়ি কলেজ।

পুথি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য - জাতীয় সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিককালে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, পাঠ ও তার চর্চা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের আগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও চিত্রটা অন্যরকম ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও শিক্ষিত মহলে প্রাচীন পুথি সম্পর্কে কৌতূহলের সীমা ছিল না। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশি পণ্ডিতদের প্রাচ্য-পুথির প্রতি আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবজাগরণের উদ্দীপনায় স্বদেশের ঐতিহ্য অনুসন্ধানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালি প্রাচীন পুথির অপরিসীম মূল্য অনুভব করে পুথিচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে, ‘মুসলমানি পুথি সাহিত্যের’[১] উদ্ধারে এই আগ্রহ তেমনভাবে চোখে পড়ে নি। কেউ কেউ আবার নিম্নমানের সাহিত্য বিবেচনা করে এই সাহিত্যধারাকে অপাঙক্তেয় করে রেখেছেন। তাই বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটি বর্তমান পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে গেছে – অন্তত এপার বাংলায়।

অন্যান্য বিষয়ের মতো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উদ্ধারেও বিদেশিরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম থেকেই দেখা গেছে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫) আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর আগ্রহের সূত্র ধরেই উইলিয়াম জোনস ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচ্য সাহিত্য-ইতিহাসাদির চর্চার জন্য বাংলায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই নিষ্ঠাবান ইংরেজ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ভাষার হাজার হাজার পুথি সংগ্রহ করেন। মূলত সংস্কৃত, আরবী-ফারসী, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, অসমিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন পুথি উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েন মার্শাল, জোন্স, হ্যালহেড, উইলকিন্স, গ্লাডউইন, কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখ ভারত-তত্ত্ববিদ। এই বিদেশিরা কী পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্যসম্ভার নিজেদের দেশে নিয়ে গেছেন, লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত J. F. Blumhardt এর প্রকাশিত প্রাচীন পুথির তালিকাটি দেখলে তা বোঝা যায়।[২]

শিক্ষিত বাঙালিরা এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের পর। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ। পরবর্তীকালে

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেনের মতো পণ্ডিতেরাও পুথি উদ্ধারের কাজে মনোনিবেশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রাচীন পুথি উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে গুরু হিসেবে বরণ করে তিনি নিজে যেমন পুথি চর্চায় মগ্ন হন, তেমনি দেশবাসীকেও আহ্বান করেন।[৩] এদিক থেকে প্রাচীন সাহিত্য চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান স্মরণীয়।

এতো গেল শিষ্ট প্রাচীন বাংলা সাহিত্য। মুসলমানি পুথি সাহিত্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শতাব্দীকাল জুড়ে মুসলমানি পুথি সাহিত্যের কয়েক শত গ্রন্থের হাজার হাজার মুদ্রণ হলেও গ্রন্থাগারগুলিতে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের এই বিপুল ভাণ্ডার বৃহত্তর পাঠক সমাজের চোখের আড়ালেই থেকে গেছে। এই গ্রন্থগুলি প্রাচ্য সাহিত্যপ্রেমী হ্যালহেড, জেমস লঙ ও Goldsack-এর মতো বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সমকালীন ও পরবর্তীকালের বাঙালি সাহিত্যপ্রেমী তথা সাহিত্য-সমালোচকদের নিকট যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি। এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি শুধু সাহিত্যিকই নন, সাহিত্যকর্মীও। "প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার আন্তরিক আগ্রহে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মত কাজকে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। একথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই, তিনিই প্রথম পুথি চর্চায় সর্বভারতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।"[৪] তিনি মনে করতেন, পুথি জাতীয় সম্পদ, এতে কারও ব্যক্তিগত স্বত্ব নেই। তাছাড়া পুথি সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা বা সম্প্রদায়গত বাছ-বিচার ছিল না। যে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে তিনি যেমন পুথি সংগ্রহ করেছেন, তেমনি মুসলমানি পুথি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির স্নেহধন্য কবি জসীমউদ্দীনের কাছ থেকে 'শহীদে কারবালা'র পুথি পেয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগ্রহ সহকারে তা পাঠ করেন এবং মুসলমানি পুথি সম্পর্কে বিশেষভাবে উৎসাহিত হন। জসীমউদ্দীনকে সঙ্গে করে মেছুয়াবাজার-গরাণহাটা-বটতলার বিভিন্ন বইয়ের দোকানে মুসলমানি পুথির খোঁজ করেন। তারপর সেগুলি পাঠ করেন এবং খাতায় লিখে নেন। ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী অবনীন্দ্রনাথের এই সাহিত্য চর্চার মূল্য অনস্বীকার্য। তবে এর পরের ঘটনা আরও তাৎপর্যবাহী। কবি জসীমউদ্দীন তাঁর 'ঠাকুর বাড়ির আঙিনা'তে বলেছেন – "এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ আসিলেন শান্তিনিকেতন হইতে। খুড়ো-ভাইপোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুসলমানি পুঁথি লইয়া আলাপ চলিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, পুঁথির একটি সংকলন বিশ্বভারতী হইতে ছাপাইবেন। পুঁথি সংকলনের খাতা বিশ্বভারতী চলিয়া গেল। সেগুলি হয়তো পড়িয়া আছে, আজও ছাপা হয় নাই।"[৫] – তবে এই দুই মহান ব্যক্তির উদ্যোগ সম্পূর্ণ বিফলে যায় নি। পরবর্তীকালে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কাছ থেকে পাওয়া তথ্যসূত্র অনুযায়ী অবনীন্দ্র-রবীন্দ্র সংগৃহীত মুসলমানি পুথির ভাড়ারটির সন্ধান পেয়েছেন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। অধ্যাপক রায় তাঁর ‘প্রাচীন পুঁথি উদ্ধারঃ রবীন্দ্র উদ্যোগ’ গ্রন্থে সেগুলির একটি তালিকাও প্রদান করেছেন। গ্রন্থ তালিকাটি হুবহু এখানে তুলে ধরা হল -

খণ্ড - ক

১. ভানুবতির লড়াই / রমজান উল্লা/ ১৩২৫ব. ২. কলমা মোনাজাত/ উর্দু মৌলুদ, নাতিয়া বাংলায় গজল/ ১৩২৬ ব. ৩. হকিকাতচ্ছালাত/ জোনাব আলি/ ১৩২৪ ব. ৪. হুরনুর বিবির কেচ্ছা/ মুনসি আব্দুল ছাত্তার ওরফে দেরাস্তুল্লা/ ১৩২৫ ব. ৫. ছহি ঝগড়ানামা/ আছিরুদ্দিন মরহুম/ ১৩২৬ ব. ৬. হুজ্জতল ইসলাম (অর্থাৎ সওয়াল জবাব)/ মহম্মদ খাতের ৭. রাতকানা জামাই / মহম্মদ দেরাস্তুল্লা / ১৩২৭ ব. ৮. ছহি মেয়ারাজনামা/ মহম্মদ খাতের/ ১৩২০ ব. ৯. বেনামাজির নছিহত/ মফিজদ্দিন আহম্মদ/১৩২৬ ব. ১০. ছাখাওতনামা/ আলেনবি ও আব্দুল ওহাব/ ১৩২৩ ব.

খণ্ড- খ

১১. সহিদে কারবালা/ ছাদ আলি ও আব্দুল ওহাব/ ১৩২৩ ব.

খণ্ড – গ

১২. সতী বিবির কেচ্ছা/ আয়জদ্দিন আহম্মদ/ ১৩২১ ব. ১৩. নছিহাতচ্ছালাত (অর্থাৎ তাম্বিল জাহেলিন) / মহম্মদ এছহাক ১৪. পরিবানু সাহাজাদী বা জামাল সাহাজাদার কেচ্ছা / মুন্সী আয়জদ্দিন/ ১৩২৪ ব. ১৫. গোলবাছানুয়ার/ ১৩২১ ব. ১৬. গোল আন্দাম/ সেখ আয়জদ্দিন আহমদ/ ১৩২৪ ব. ১৭. ছহি বড় আবুসামা/ জয়নাল আবেদিন/ ১৩২৫ ব. ১৮. ছহি বড় সূর্যউজাল/ এবাদত খা/ ১৩২৬ ব.

খণ্ড – ঘ

১৯. চন্দ্রাবলীর পুঁথি/ দ্বিজ পশুপতি

খণ্ড – ঙ

২০. ছেকান্দারনামা (বারির)/ আয়েজদ্দিন/ ১৩২০ ব.

খণ্ড – চ

২১. হালতুন্নবি/ ছাদেক আলি/ ১৩২০ ব.

খণ্ড – ছ

২২. হাসর মিছীল/ ১৩২২ ব. ২৩. সাতকন্যার বাখান (ও গৃহ জামাতার বিবরণ)/ নুর মরহুম বিরচিত মহম্মদ আফজল সংগৃহীত, শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত/ ১৩১৬ ব. ২৪. চন্দ্রমুখীর পুঁথি/ ১৩২৪ ব. ২৫. মোহছেনল এসলাম বা উপদেশ ভাণ্ডার/ ছাজ্জাদ আলী/ ১৩২৬ ব.

খণ্ড – জ

২৬. ছহি বড় খাবনামা/ মহম্মদ ইউসুফ সংগৃহীত/ ১৩২৪ ব. ২৭. দেল দেওানা/ আব্দুর রহিম/১৩১৭ ব. ২৮. আহ কামলজবে/ মহম্মদ মরহুম/১৩২০ ব. ২৯. আহ কামল জোমা/ মহম্মদ

মরহুম/ ১৩২০ ব. ৩০. রেজওয়ান সাহা/ সেদমত আলি/ ১৩১৯ ব. ৩১. বড় হেদায়েতুল এছলাম/ মনিরুদ্দিন আহম্মদ/ ১৩২৬ ব. ৩২. নকসে ছোলেমানি/ আব্দুল করিম/ ১৩২২ ব. ৩৩. তিরছি নেগাহ / বজলের রহমান/ ১৩২২ ব. ৩৪. মরসেদনামা/ আয়জদ্দিন আহম্মদ/ ১৩২৩ ব.

খণ্ড – ঝ

৩৫. লজ্জাবতীর পুঁথি/ আজহার আলি/১৩২৬ ব. ৩৬. জোলমাতনামা/ আসিরুদ্দিন / ১৩২৫ ব. ৩৭. যামিনী ভান ও রোকমনিপরীর কেচ্ছা/ ১৩২৩ ব. ৩৮. সাশুফি শুলতান পাড়ুয়ার কেচ্ছা/মহিরুদ্দিন তন্তাগার/ ১৩২৬ ব. ৩৯. সোনাভান/ গরিবুল্লা/ ১৩২৬ ব. ৪০. পীর ফরিদ/ আবদুল কাদের/ ১৩১১ ব. ৪১. রাজকন্যা মধুমালা/ জবেদ আলি/ ১৩২৫ ব.

খণ্ড – ঞ

৪২. ছহি বড় সাহানামা/ মহম্মদ খাতের/ ১৩২৩ ব.

খণ্ড – ট

৪৩. ছহি বড় কাছাছোল আম্বিয়া/ ১৩২৫ ব.

খণ্ড – ঠ

৪৪. আদম ওজুদ তত্ত্ব/ আব্দুল কাদের ৪৫. কলির নছিহত/ রমজানউল্লা/ ১৩২০ ব. ৪৬. জফিলতে দরুদ/ জোনাব আলি/ ১৩২০ ব. ৪৭. সত্যপীরের পুঁথি/ ওয়াজেদ আলি/ ১৩২৬ ব. ৪৮. ছহি মউতনামা/ আশরাফ আলি/ ১৩২৩ ব. ৪৯. হায়রাতুল ফেকা/ আতাউল্লা/ ১৩২৬ ব. ৫০. বড় তুতিনামার কেচ্ছা/ মহম্মদ খাতের/ ১৩২১ ব.

খণ্ড – ড

৫১. ছহি গোলসানেরূম/ আব্দুল জব্বার/ ১৩২৬ ব.[৬]

এই তালিকায় বাঁধানো ১৩টি খণ্ডে ৫১টি গ্রন্থের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী সময়ে(২০০৪খ্রি.) বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সন্ধান চালিয়ে সব কটি খণ্ডের সন্ধান পাইনি। আবার এমন কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যা ড. বিশ্বনাথ রায়ের তালিকায় নেই। পরে, প্রাপ্ত মোট ৪২টি গ্রন্থের মধ্যে ২৮টি উপরিউক্ত তালিকায় রয়েছে। এছাড়া, তালিকা বহির্ভূত ১৪টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন –

১. মুনশী আয়জদ্দিন আহাম্মদ/ ছেকেন্দারনামা বারির পহেলা জেলেদ/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২০ ব.

২. মুনশী মোজাম্মেল হক/ ছেকেন্দারনামা বাহরি দ্বিতীয় জেলেদ/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২০ ব.

৩. মুনশী ফছিহদ্দিন/ ছহি মেছবাহুল এছলাম/ বরকতিয়া হবিবি লাইব্রেরী, ১৩২৯ ব.

৪. দারিকানাথ রায়/ বাহারদানেস/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩১৩ ব.

৫. ডাক্তার মোজাম্মেল হক/এলাজে বাঙ্গালা, পহেলা জেলেদ/সোলেমানী প্রেস,কলকাতা,১৩২৬ ব.

৬. মৌলবি দোস্ত মহাম্মদ চৌধুরী/ খয়বরের জঙ্গনামা দুলদুল ঘোড়া ও জোলফোক্কারের কেরামত/ সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী/ কলকাতা ১৩২৬ ব.

৭. সেখ আমিরুদ্দিন/ ছহি মনছুর হাল্লাজ ও সমছ তবরিজের কেচ্ছা/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২৪ ব.

৮. মুন্সি গরীবুল্লাহ/ ইমানদার নেকবিবির কেচ্ছা/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২৬ ব.

৯. মৌলবী আব্দুল কাদের/ মাজারে ফেরদাউছ অর্থাৎ ওফাতনামা/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২৪ ব.

১০. মৌলবি আব্দুচ্ছোবহান/ নকল বাজিগরের কথা অথবা হাবিল কাবিলের কেচ্ছা/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২৩ ব.

১১. কোমরদ্দিন/ বেনজির বদরে মনির/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা।

১২. জোবেদ আলী খোন্দকার/ নইদাচান্দ কুম্ভিরের পুঁথি/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২১ ব.

১৩. মুনশী আব্দুল জব্বার/ সোলেমানে রূম বা কেচ্ছা দেলখোস/ সিদ্দিকিয়া প্রেস, কলকাতা, ১৩২৬ ব.

১৪. মুনসী ছাদ আলী ও মুনসী আব্দুল ওহাব/ সহিদে কারবালা/ সোলেমানী প্রেস, কলকাতা, ১৩২৩ ব.

তালিকা থেকেই অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ সংগৃহীত মুসলমানি পুথি সাহিত্যের ভাড়ারটি নেহাত ক্ষুদ্র নয়। বর্তমানে এপার বাংলায় সংরক্ষিত মুসলমানি পুথি সাহিত্যের সর্ববৃহৎ ভাণ্ডার। এছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী ও কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কিছুসংখক মুসলমানি পুথি সাহিত্য সংরক্ষিত রয়েছে। এই গ্রন্থগুলির বেশিরভাগই রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান, মুসলমান বীরদের কাল্পনিক যুদ্ধজয়ের কাহিনি, পিরগাথা ও ধর্মকথা অবলম্বনে রচিত।

বলাবাহুল্য, প্রচলিত অর্থে পুথি বা Manuscript বলতে যা বোঝায়, অবনীন্দ্র-রবীন্দ্র সংগৃহীত আলোচ্য পুথিগুলি তা নয়। এগুলি ছাপাখানায় মূদ্রিত। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষায় এই পুথিগুলি রচিত।হজরত মহম্মদের জীবনী, পির-পয়গম্বরদের জীবন কাহিনি, কারবালার করুণ কাহিনি, আমীর হামজার জীবন বৃত্তান্ত, সোনাভান-জৈগুন প্রমুখ বীর রমনীদের লাভের জন্য হানিফার যুদ্ধের বর্ণনা, লাইলি-মজনু ও শিরী-ফারহাদের অমর প্রেমকাহিনি, কালুগাজী, ইসমাইল গাজী, বনবিবি ও পিরগণের ঐতিহ্যমূলক কাহিনি অবলম্বনে আদ্যোপান্ত মুসলমানি রীতিতে এই গ্রন্থগুলি রচিত। যেমন--

১. আরবী, ফারসী পুথির অনুকরণে এই গ্রন্থগুলির শুরুতেই 'হামদ' বা আল্লাহর প্রশংসা, অতঃপর 'নাত' অর্থাৎ হজরত মহম্মদের গুণকীর্তন করা হয়েছে।

২. মুসলমানি পুথিগুলি বাংলা হরফে ছাপা এবং পংক্তিগুলি বাংলা নিয়মে বাম থেকে ডানে পড়তে হয়। কিন্তু পৃষ্ঠাগুলি শুরু হয় আরবী-ফারসী গ্রন্থের অনুরূপ ডানদিক থেকে এবং শেষ হয় বামদিকে।

৩. ছাপাখানায় মুদ্রিত হলেও এর কাগজগুলি যেমন অত্যন্ত নিম্নমানের তেমনি হরফগুলি সাধারণ গদ্যের হরফের তুলনায় অনেক বড়। পুথির আদল ধরে রাখার প্রয়াস এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়।

৪. গ্রন্থগুলি পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে রচিত হলেও টানা গদ্যের মত ছাপা হয়েছে। পুথির স্টাইলকে ধরে রাখার এই চেষ্টা গ্রন্থগুলির সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

৫. ছাপা গ্রন্থ হলেও নামকরণে এমন কী ভণিতায় এগুলিকে পুথি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, লজ্জাবতীর পুঁথি', 'চন্দ্রাবলীর পুঁথি' ইত্যাদি।

৬. এছাড়াও একদাড়ি (।), দুই দাড়ি (।।) ও পুষ্পিকা চিহ্নের (*) ব্যবহার এবং একই শব্দ দুবার লেখার বদলে শব্দটির পাশে '২' লেখার রীতি গ্রন্থগুলির সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে।

- এই সমস্ত কারণে গ্রন্থগুলিকে মুসলমানি পুথি সাহিত্য বলে চিহ্নিত করা হয়। মহম্মদ শহীদুল্লাহ এই বিশেষ সাহিত্যধারাকে 'বাংলার মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এই সাহিত্যধারা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন- "গুটি কতক শিক্ষিত লোককে ছাড়িয়া দিলে, এখনও এই পুঁথি সাহিত্য বাংলার বিশাল মুসলমান সমাজের আনন্দ ও শিক্ষা সম্পাদন করিতেছে। পুঁথি-পাঠক যখন সুর করিয়া পুঁথি পড়িতে থাকে, তখন শ্রোর্তৃবর্গ কখন কারবালার শহীদগণের দুঃখে গলিয়া যায়, কখন আমীর হামজার বা রুস্তমের বীরত্বে মাতিয়া ওঠে, কখন বা হাতেমের দয়ায় ভিজিয়া যায়। বেচারাদের আহার-নিদ্রার কথা, ঘর-সংসারের কথা, দুঃখ-দৈন্যের কথা মনে থাকে না। ... যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।"[৭] মহম্মদ শহীদুল্লাহর এই মন্তব্য কতখানি সঙ্গত, সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, তাঁর এই উক্তির মধ্যেও মুসলমানি পুঁথি সাহিত্য নামের সমর্থন মেলে।

অবশেষে বলতে হয়, এক সময়ে আপামর গ্রাম-বাংলার জন-সাধারণের মনোরঞ্জনকারী, মহম্মদ শহীদুল্লাহ কথিত 'বাংলার মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যে'র প্রথম পরিচয় মেলে জেমস লঙের 'A Descriptive Catalogue of Bengali works' (1855) এবং J. F. Blumhardt-এর 'Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museam' (1885) গ্রন্থদ্বয়ে। তারপর বাংলার সাহিত্যপ্রেমীদের অনেকেই তাঁদের লেখায় মুসলমানি পুথি সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন। যাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আনিসুজ্জামানের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে এঁদের কেউই এই সাহিত্যধারার কোন সংকলন

গ্রন্থ প্রকাশ করেন নি কিংবা অনুপুঙ্খ বর্ণনাও দেননি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সংকলন প্রকাশের ভাবনা এবং বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সেগুলির সংরক্ষণ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রকে অনেক বেশি প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছেও রবীন্দ্রনাথের এই দান অপরিসীম। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের যে সংকলনটির উল্লেখ জসীম উদ্দীন করেছেন সেটির উদ্ধার সম্ভব হলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্ভারে এক নবমালতীর সংযোজন হবে – এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র ও প্রসঙ্গ নির্দেশ:

১. অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবী-ফারসি-উর্দু-হিন্দি মিশ্রিত বাংলা ভাষায় রচিত বিশেষ এক শ্রেণির সাহিত্য সমকালীন আপামর প্রথাগত শিক্ষা বঞ্চিত বা নিরক্ষর গ্রাম্য জনসাধারণের সাহিত্য-রস-পিপাসা নিবৃত্ত করেছিল। হজরত মহম্মদের জীবনী, কারবালার করুণ কাহিনি, আমীর হামজার যুদ্ধ বৃত্তান্ত, সোনাভান-জৈগুণ প্রমুখ বীর রমণীকে লাভের জন্য হানিফাদের যুদ্ধের বর্ণনা, হাতেম তাই-এর কেচ্ছা, লায়লি-মজনু ও শিরী-ফারহাদের করুণ প্রণয় কাহিনি, কালুগাজী-চম্পাবতী, বনবিবি ও পিরগণের ঐতিহ্যমূলক কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই বিশেষ সাহিত্যই মুসলমানি পুথি সাহিত্য।

২. অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ঃ প্রাচীন পুঁথি উদ্ধারঃ রবীন্দ্র উদ্যোগ (১৩৯৯), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৪

৩. ঐ পৃষ্ঠা - ৫

৪. ঐ নিবেদন অংশ

৫. জসীম উদ্দীনঃ ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৯২), পলাশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৬৮

৬. অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৩

৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহঃ বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড), (১৯৯৯), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা – ২০৯